গডফাদার সমাচার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত —হেলসিংকি ফিনল্যান্ড থেকে ড. মনজুর আলম

'গডফাদার' নাম শুনে ইটালির কুখ্যাত মাফিয়া দলের হ্যাট পরা ক্রাইম লীডারদের মনে পড়ার দিন গত হয়েছে অনেক দিন। আজকাল 'গডফাদার' নাম শুনলেই আমরা মানসচোখে কিছু দেশীয় লোকদের দেখতে পাই। নেতা গোছের হলেও আমাদের মতই দেখতে। অনেকের কিছু বাতিক থাকলেও পুরোদস্তুর 'দেশী মাল'। বিদেশী বা ইটালীয় নয়। বাংলাদেশে এ নাম বাচ্চাদের কাছেও পরিচিত। 'গডফাদার' শব্দ বিদেশী মাত্রা ছেড়ে এখন পুরোপুরি দেশী। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান ইত্যাদির মতই বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে, গডফাদারদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক গবেষণা, গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিলেও এটা নিশ্চিত বলা যায়, আধুনিক অর্থে 'গডফাদারদের' সাথে আমাদের পরিচয় সাম্প্রতিক কালের। বাংলাদেশে গডফাদারদের উঠতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায়; তাদের সৃষ্টি হঠাৎ করে হয়নি। আদর সোহাগ দিয়ে পুষতে হয়েছে। ঝড়ঝাপটায় আগলে রাখতে হয়েছে। সাহস দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়েছে। ছোট মস্তানরা এভাবেই দিনে দিনে বড় হয়ে বড় সন্ত্রাসী হয়েছে এবং একদিন গডফাদার বলে পরিচিত হয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয়ই গডফাদারদের রক্ষা করেছে। কোন না কোন দলের নেতা বা অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধির ঢাল রক্ষাকবজ হিসাবে কাজ করেছে। রাজনৈতিক দলের নেতা 'গডফাদারে' রূপান্তরিত হওয়ার কারণ অনেক। তবে, অনেকের মতে সার্বিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অদম্য ইচ্ছা, সর্বময় প্রভাব বিস্তারে প্রচণ্ড আগ্রহ, অর্থ, সম্পদ ও ভোগের প্রতি চরম দুর্বলতা ও জনগণের প্রতি আস্থার অভাব এর উল্লেখযোগ্য।

মানুষ ক্ষমতাবান হতে চায়, প্রভাব বিস্তার করতে চায়, অর্থ ও সম্পদ পেতে চায়। এটা কোন বিশেষ দোষ বা গুণ নয়। সাধারণ মানুষের মাঝে এগুলো থাকা স্বাভাবিক। এগুলো মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা অভিলাষ মাত্র। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে গডফাদারদের কি দোষ? তাদেরও অভিলাষ বা ইচ্ছা হতে পারে প্রভাব বিস্তার করতে, ক্ষমতাবান হতে, সম্পদ ও অর্থ বানাতে, ভোগ করতে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের অভিলাষ বা ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। প্রশ্ন হচ্ছে, ইচ্ছা বা অভিলাষ পূর্ণ করতে সে কি সকল উপায় অবলম্বন করছে? উপায়গুলো সামাজিকভাবে মেনে নেয়া হয়েছে কি না? সামাজিক বিচারে অবলম্বিত পথসমূহ কি শুদ্ধ না অশুদ্ধ? এসকল প্রশ্নের জবাবের ওপরই নির্ভর করে একজন মানুষের সামাজিক ও আইনগত অবস্থান। ভাল না মন্দ। দোষী না নির্দোষ।

সাধারণ দৃষ্টিতে, সহজ বিশ্লেষণে, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা বলা চলে, যে সকল কারণে আমরা একজনকে গুণ্ডা, বদমায়েশ, জোচ্চর, লম্পট, খুনী, ডাকাত ইত্যাদি বলি এগুলোর সাথে রাজনৈতিক নেতাগিরি যুক্ত করেই গডফাদার সৃষ্টির 'বীজ' বপন করা হয়। আর এখানেই সমস্যা। আমাদের দেশে আগাছার বীজ ভণ্ড রাজনীতির ভণ্ড পরিবেশে, অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় আজ বিশাল জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। আজ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের সমাজে, 'তথাকথিত রাজনীতি' ও 'গডফাদা'র একই সুতোয় গাঁথা। আর এ সর্বনাশা সুতায় ফাঁস দিয়ে মারা হচ্ছে প্রতিদিন সাধারণ মানুষদের। ভিটে-বাড়ী ছাড়া করা হচ্ছে অসহায় মানুষদের। ইজ্জত লুটা হচ্ছে মা-বোনদের। খুন করা হচ্ছে কোলের মাসুম বাচ্চাদের। সে কারণেই শুধু 'গডফাদারদের' মন্দ বলে বা লিখে কি লাভ? সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করে রাজনৈতিক ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়। ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বয়কট করার আন্দোলন শুরু হয়। যে সকল রাজনৈতিক জ্যাক গডফাদার তৈরী করে, আশ্রয় দেয়, দুধকলা খাওয়ায় তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে, গডফাদারদের আশ্রয়দানকারীদের বিরুদ্ধে কলম না ধরলে গডফাদার সংস্কৃতি আমাদের দেশ থেকে দূর হবে কি?

ভণ্ড রাজনীতিবিদদের কোলে চড়ে, তাদের হাতের মোয়া খেয়ে, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য গাদা গাদা লিখেই কি সমস্যার সমাধান হবে? 'গডফাদার' বানানোর কারখানার বিরুদ্ধে কিছু না বলে দু'এক সন্ত্রাসী বা গডফাদার কোথায় কি করলো তা নিয়ে কলাম লিখে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ফায়দা হয়তো হবে কিন্তু সন্ত্রাসের শিকার মৃত মানুষগুলোর বংশধরদের বাঁচানো যাবে কি? গডফাদার বানানোর কারখানা হতে আরও যে অনেক

‘গডফাদার’ সার্টিফিকেট নিয়ে বের হয়ে আসছে, তারা কি আঙ্গুল চুষবে? আসল কুচক্রীদের আড়াল করে আর যাই হোক শান্তি আসবে কি? দেশের মানুষদের বোকা বানানোর জন্য সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ, আবার সুযোগ পেলে নিজ দলের সন্ত্রাসী বা গডফাদারদের সমাজপতি বা প্রতিনিধি বানানোর চেষ্টা করলে দেশে খুন-রাহাজানি কি কমবে? নিজ দলের সন্ত্রাসীদের লালন-পালন এমনকি গণপরিষদে নির্বাচিত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে গডাফাদারদের কি সরানো যাবে? রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে এ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কিছু না লিখে মিউ মিউ করলে কি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন কমবে?

তদুপরি, লোক দেখানো প্রতিক্রিয়া চলতে থাকলে ‘গডফাদাররাই’ দেশের আইন প্রণয়ন করবে আর আমরা তাদের প্রজা হয়ে থাকবো– এটাই তো স্বাভাবিক। এ সমাজে যতদিন ভণ্ড রাজনীতিবিদ ও গডফাদারদের ‘হানিমুন’ চলবে ততদিন আমাদের এ পতিত সমাজেই বাস করতে হবে। মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হবে, অসহায় পরিবারের রক্ত ঝরবে। এতে হতবাক হওয়ার কি আছে?

গডফাদারদের হাত হতে মুক্তি চাই বললেই তো আর মুক্তি নেই। তাহলে তো পৃথিবীর চেহারাই অন্যরকম হতো। গডফাদাররা এখন আর সাধারণ কিছু নয়, তারা এখন রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতাদেরও ‘গডফাদার’। দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস সে কথাই বলে। যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হত্যা, খুন ও বর্বরতার ওপর লিখতে লিখতে আজ কলমের কালি শেষ করে ফেলছেন, বিভিন্ন রিপোর্ট করে দেশে বিদেশে পাঠাচ্ছেন, বিদেশে বাংলাদেশীদের ভাতে-পানিতে মারার ব্যবস্থা করছেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কয়েক বছর আগেও সন্ত্রাসের ঘটনা কি ঘটেনি? গডফাদাররা কি অত্যাচার করেনি? দেশের মানুষ কি মরেনি? মা-বোনের ইজ্জত কি লুট হয়নি? তখন কেন দু’কলমও লিখেননি? ‘গডফাদার আছে এবং থাকবে’ বললেও কেন মুখে কলুপ এঁটে বসেছিলেন। আর এখানেই সমস্যা। নিজের দলের ‘গডফাদার’ হলে সোনার ছেলে, অন্য দলের হলে জালিম, জানোয়ার। দুটোই যে ‘জানোয়ার’ সে কথা বলার সৎ সাহস যাদের নেই, তাদের হাজারো রিপোর্টের দাম ক’পয়সা, দেশের মানুষই ভাল বলতে পারবে।

তবে একথা ঠিক, আজকের নব্য কুমিরদের ক্রন্দন কারো জন্য নয়। দেশের, জনগণের বা দলের জন্যও নয়। আঁতেল কুমিরদের ক্রন্দন শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই। আঁতেলদের তুলনায় ‘গডফাদাররা’ অনেক বেশী স্বচ্ছ এবং সহজ। তারা অন্তত নিজের লোকের সাথে ‘নিমকহারামী’ করে না। অন্যায় যা করে লোক-সম্মুখেই করে। ভণ্ডামী করে না। সমাজ প্রশ্রয় দেয় বলেই, নেতা-মন্ত্রীদের ছায়া পায় বলেই, সরকার কিছু করে না বলেই তারা বেড়ে ওঠে। বাড়তে বাড়তে এক সময় সমাজের, নেতাদের এবং সরকারেরও মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে যাদের সহায়তায় তারা বেড়ে ওঠে, যাদের সাহায্য করতে তারা জীবন বাজি ধরে, তারাই তাদের মৃত্যুর ফরমান জারি করে। তাই, আমার মতে গডফাদাররা দাবা খেলার ‘সৈনিক’ মাত্র। রাজা, মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া বা নৌকা সৈনিকদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে আর প্রয়োজন শেষ হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর এ খেলার পেছনে বুদ্ধির যোগানদাররা আরও ভয়ঙ্কর। তাদের চালের আসল উদ্দেশ্য বুঝা দায়। ‘গডফাদারদের’ জন্য তাই করুণা হয়, আঁতেলদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সাধারণ ও স্বচ্ছ। অন্তত ভণ্ডামীর খোলস তাদের নেই।

সম্প্রতি দেশের বিশিষ্ট ‘সিভিল সোসাইটি’ এক আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনায় দেশে দুইপ্রধান রাজনৈতিক দলের মহাসচিব সাহেবরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। দেশের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল টাকাওয়ালা, সন্ত্রাসী গডফাদার ও আমলাদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে ব্যাকুল হয়েছেন।

আলোচনার ক্রান্তিতে একে অপরের কাছে নিশ্চয়তা চেয়েছেন, নিজ দল হতে সন্ত্রাসী, গডফাদারদের বের করে দিলে অপর দল যেন তাদের বরণ না করে! অপর দলে চলে যাবে সে ভয়েই নাকি বের করা যাচ্ছে না’ বলে আফসোস করেছেন! আলোচনার বিষয় কেন যে ‘ভণ্ড রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কার ও শাস্তি প্রদান; সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষার পূর্বশর্ত’ হয়নি সেটাই ভাবছি। তাহলে দেশের দুই স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ অন্তত গুরুত্বপূর্ণ এ আলোচনা প্রক্রিয়াটা শুরু করতে পারতেন।

যা হোক আলোচনা শেষে, দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলো বড় বড় হরফে এ অঙ্গীকার চাওয়ার ও আফসোসের

কথা জনগণকে জানিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে আশার প্রদীপ দেখা যাচ্ছে বলে অনেকে অনেক পত্রিকা ও সাময়িকীতে লিখেছেন। লেখাগুলো পড়ছি আর ভাবছি– এ কোন্ সমাজে আমাদের বাস? বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মহাসচিবরা যেখানে অসহায়, সেখানে আশার প্রদীপ কোথায়? যে কোন দেশে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তরা জেলে থাকবে, ফাঁসির অপেক্ষা করবে– এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ, আমাদের দেশের সরকারী দল ও বিরোধী দল শুধু যে তাদের পুষছে তাই নয়, ছেড়ে দিতেও ভরসা পাচ্ছে না! এমন 'অমূল্য রত্নরা' যদি অন্য দলে ঢুকে যায়, অপর দল যদি তাদের সাদরে টেনে নেয়। ভাবখানা 'দামী অ্যালসেসিয়ান কুকুর' খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছি কিন্তু বড় বেশী বজ্জাত হয়ে গেছে, সামাল দেয়া যাচ্ছে না। আবার ছেড়ে দিতেও ভয়– অন্য বাড়ীর লোক যদি তুলে নেয় তখন যে আবার কামড় খাওয়ার ভয়'! কুকুর বজ্জাত বা পাগল হলে কি করতে হয় সে কথা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। এটা কি ইচ্ছাকৃত ভুল? নাকি নিজস্ব স্বার্থেই ভুলে থাকা? আশার আলো কোথায়?

আশা তো দূরের কথা, আমি ভাবছি দেশের প্রধান দু'টি দলের মহাসচিবরা এ কি বলছেন! একদল এইতো সেদিন ক্ষমতায় ছিল, আজ দেশের প্রধান বিরোধী দল। দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। চারদিকে সন্ত্রাস দেখে জেগে উঠেছেন। অথচ শাসনের পাঁচ বছরে কি ঘুমটাই না দিয়েছেন! কুম্ভকর্ণও সে ঘুমের কথা জানলে লজ্জা পাবে। আরেক দল গত নির্বাচনে তাদেরই নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। নির্বাচনে অঙ্গীকার ছিল– সরকার গঠন করলে, দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করবো। এখন অপর দলের মহাসচিবকে

জড়িয়ে ধরে হা-হুতাশ করছেন। ওয়াদা চাইছেন প্লিজ ভাই, আমরা দল থেকে গুণ্ডাদের বের করে দিলে তোমরা ওদের ভিআইপি করো না, দলে টেনে নিও না! এটা কি আশার কথা হলো?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে আশার প্রদীপ দেখা যাচ্ছে বলে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের সাথে একমত হতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম। যতটুকু বুঝেছি, যতটুকু পড়েছি তাতে দু'দলের মহাসচিবদের আলোচনায় 'চারটি' বিষয় পরিষ্কার হয়েছে ঃ

১. আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের ওপর ক্রমাগত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে;

২. রাজনৈতিক নেতারা অসহায় বোধ করছেন, দুধকলা খাইয়ে পোষা সাপদের আর সামাল দিতে পারছেন না;

৩. সন্ত্রাসী গডফাদারদের উচ্ছেদ করার ওয়াদা 'সরকার' পুরোপুরি পালন করতে পারছেন না;

৪. প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে একেবারেই বিশ্বাস করছে না।

পাঠক সমাজ, আপনারাই বলুন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আকাশে আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পাচ্ছেন কি? সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, দু'টি দলই জানে তাদের দলে সন্ত্রাসী বা গডফাদার আছে কিন্তু বহিষ্কার করছে না, ভয় অন্য দল যদি তাদের নিয়ে নেয়! এ কেমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি। তাহলে 'গডফাদারদের' দোষ দিচ্ছি কেন? যারা সন্ত্রাসী নামক সাপগুলোকে দুধকলা খাইয়ে বড় করছে,

সাপের মণির মত রক্ষা করছে তাদের কোন দোষ নেই? যত দোষ কেবল সন্ত্রাসীদের?

ঐতিহাসিক গণরায় পেয়ে যে দল সরকার গঠন করেছে, আমার প্রশ্ন সে দল অন্যের কাছে দয়া চাইছে কেন? অপরাধীকে অন্য দলে স্থান দেবে ভেবে? দেশে আইন বলে কি কিছু নেই? আইন প্রয়োগ করার অধিকার জনগণ কেন তবে তাদের দিয়েছে? যে সন্ত্রাসী, যে অত্যাচারী, যে খুনী তার বিচার হবে, এইতো স্বাভাবিক। তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করতে অপর দলের করুণার কি প্রয়োজন? আর কেনই বা প্রয়োজন? সন্ত্রাসী বা গডফাদারদের যেই সহায়তা করবে, দলে বরণ করবে, বিরোধী দলের বা সরকারী দলের যত বড় নেতা হলেও বিচারের কাঠগড়ায় নেয়ার ক্ষমতা জনগণ গত নির্বাচনে বর্তমান সরকারকে দিয়েছে। সরকারেরই দায়িত্ব দেশের সন্ত্রাস দমন করার। গডফাদারদের রাজনীতি দেশ হতে চিরতরে অপসারিত করার, অন্যায়কারীদের বিচার করার। বিরোধী দলের সে দায়িত্ব নয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বৈধতা, সন্ত্রাসী বা গডফাদাররা হারালে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজনৈতিক কদর ফুরিয়ে যাবে। তাই বিচার ত্বরান্বিত করার দায়িত্বও সরকারের।

উপসংহারে বলা যায়, কারও করুণার ওপর নির্ভর করে বা করুণা পেয়ে দায়িত্ব হতে সরে আসার বা বিফল হওয়ার কোন সুযোগ সরকারের তথা সরকারী দলগুলোর একেবারেই নেই। প্রয়োজনে সরকারী কাঠামোয় যে কোন

পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের দায়িত্ব জনগণ বর্তমান সরকারকে দিয়েছে। জনগণ শান্তিতে থাকতে চায়। সরকার বা সরকারী দলগুলোর এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে কারও করুণার ওপর নির্ভর করে জনগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ তারা দিতে পারবে না। আপন শক্তিতে মহীয়ান হয়ে, নিজের দুর্বলতার প্রতি কঠোর হয়ে, জনগণকে সাথে নিয়েই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। প্রাথমিকভাবে কষ্টকর হলেও জনগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা অবশ্যই সম্ভব। কঠিন হলেও সম্ভব। **লেখক ঃ শিক্ষক, কলামিস্ট।**

ইসলামে গণতন্ত্র ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'গণতন্ত্র' পরিভাষার প্রতি এলার্জি

সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম চালু হয়। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য থেকেই গণতন্ত্র প্রাচ্যে এসেছে। তাদের গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব জোরেশোরে প্রচারিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসীদের কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন। কিন্তু এটা গণতন্ত্রের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' কথাটি অবশ্যই কুফরী বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের এ সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহণ করি না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে? মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যাদের ওপর দায়িত্ব থাকে, তাদের অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করে থাকেন। তাই 'গণতন্ত্র' পরিভাষার প্রতি এমন এলার্জি যুক্তিযুক্ত নয়। ইংরেজী এলার্জি (Allergy) শব্দটির অর্থ হল 'যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'। তারা যদি গণতন্ত্র পরিভাষাটির বিকল্প কোন

পরিভাষা তৈরী করে দুনিয়ায় চালু করার কোন ক্ষমতা রাখেন, তাহলে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু কোন বিকল্প পরিভাষা আবিষ্কার না করে গণতন্ত্রকে 'কুফরী মতবাদ' বলা মোটেই সংগত নয়। আজ পর্যন্ত তারা এর বিকল্প পরিভাষা দিতে পারেনি। এর বিকল্প হিসাবে 'বিপ্লব' পরিভাষা ব্যবহার করা মোটেই গ্রহণযোগ নয়। মাদ্রাসা কমিটিতে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বিপ্লবী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

মনগড়া ব্যাখ্যা

সবাই এ কথা স্বীকার করে যে, কোন কথার এমন ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যা বক্তার

উদ্দেশ্য নয়। কোন লেখক বা বক্তার কোন কথার একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তাই যার কথা তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মন্দ অর্থ গ্রহণ করা নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক নয়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে লেখা আছে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে কি তা লেখা হয়েছে? এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই হাসিল করতে হবে। সেনাবাহিনীর বা কোন সশস্ত্র সন্ত্রাসী শক্তি অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখল করলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঐ কথাটি এমন ভাষায় হলে বেশী সঠিক হত যার অন্য অর্থ করা যায় না। যেমন ঃ 'শাসন ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ থেকেই হাসিল করতে হবে'। অর্থাৎ ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সকল ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই ফায়সালা করতে হবে।

জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টকে 'সার্বভৌম' বলা হয়। এখানেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করা উদ্দেশ্য নয়। এর অর্থ হল ঃ বাংলাদেশের আইন-রচনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এ সংসদ দেশের বাইরে বা ভিতরের কোন শক্তির অধীন নয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে এ কথাও লেখা আছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয়

কার্যাবলীর ভিত্তি'। তাই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম বলা হয় না। এ পরিভাষাটির বিকল্প পরিভাষা তালাশ করা যেতে পারে। তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বুঝাবার জন্য এ পরিভাষাটির ওজন বিশ্বে স্বীকৃত। **(চলবে)**

ঘুম পায় কেন?

আমরা যখন জেগে থাকি তখন স্নায়ু কেন্দ্রগুলো কর্মরত থাকে। বিশেষ করে ওরা রক্ত কোষের সাহায্যে মস্তিষ্কে রক্ত পরিচালিত করে। কয়েক ঘন্টা এইভাবে কাজ করলে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্নায়ু কেন্দ্রগুলো। ফলে রক্ত চলাচলের বেগ অনেকখানি কমে আসে এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। উক্ত কারণে ঘুম পায় মানুষের, নিদ্রার পর স্নায়ু কেন্দ্রগুলো পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে এবং মস্তিষ্কও তখন কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। তাই নিদ্রার পরে অবসাদ দূর হয়। **আবদুল মালেক জাবির**

কাঁচা, পাকা ও শুকনো আমের পুষ্টিমান

পুষ্টিগত উপাদান	**কাঁচাআম**	**পাকা আম**	**শুকনো আম**	
আমিষ	০.৭ গ্রাম	১.০ গ্রাম	২.৮ গ্রাম	
চর্বি	০.১	০.৭ ”	৭.৮ ”	
কার্বোহাইড্রেট	১০.১ ”	২০ ”	৬৪ ”	
কেলসিয়াম	১০ মি গ্রাম		১৬ মিঃ গ্রাম	১৮০ মিঃ গ্রাম
লৌহ	৫.৪ মিঃ গ্রাম		১.৩ মিঃ গ্রাম	৪৫.১ মিঃগ্রাম
পুষ্টিগত উপাদান	**কাঁচাআম**	**পাকা আম**	**শুকনো আম**	
মিনারেল	০.৪ গ্রাম	০.৪ গ্রাম	৪.৯ গ্রাম	
ভিটামিন-এ	৯০ এম আর গ্রাম		৮৩০০ এম আর গ্রাম	-
ভিটামিন-বি	০.০৭ মিঃগ্রাম		০.১ মিঃগ্রাম	-
ভিটামিন-সি	৬৩ মিঃগ্রাম		৪১ মিঃগ্রাম	৪১ মিঃ গ্রাম
ক্যালরি	৪৪ কিলোঃ ক্যালরি		৩৩৭ কিলো ক্যালরি	৩৩৭ কিলো ক্যালরি

তথ্য সূত্রঃ পুষ্টি গবেষণা পরিষদ

জাকির হোসেন

শহীদ মিনারে ফুল দিলে পাপও হয় না, পুণ্যও হয় না

মদের দাম কমিয়ে তিন দিনে সরকারের যে ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে তা তিন বছরে পূরণ হবে না ঃ আবদুল কাদের মোল্লা

চারদলীয় ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা বলেছেন, মদের দাম কমানোয় ৩ দিনে জোট সরকারের যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা ৩ বছরে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে এ কাজ করেছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বর্তমান বাজেট ভারসাম্যমূলক। শহীদ মিনারে ফুল দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শহীদ মিনারে ফুল দেয়াতে কোন পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তবে যদি কেউ সেখানে

গিয়ে দোয়া করেন তবে যিনি করেন ও যার উদ্দেশ্যে করেন তাদের উভয়েরই সওয়াব হয়। ১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ১৯৭১ সালে আমরা দেশের জনগণের ওপর কোন হত্যা-নির্যাতন চালাইনি। তবে কয়েকটি কারণে আমাদের একটি রাজনৈতিক অবস্থান ছিল, সে আশঙ্কা বিগত ত্রিশ বছরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণে আমাদের দুঃখ প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমাদের কোন আচার-আচরণে দেশের জনগণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন সেজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। জনাব আবদুল কাদের মোল্লা সম্প্রতি চলমান বাজেট ও সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে দৈনিক ইনকিলাবকে এক খোলামেলা সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হল ঃ সাক্ষাৎকার গ্রহণে ঃ **মেহেদী হাসান পলাশ**

ইনকিলাব ঃ বর্তমান বাজেটের ভাল দিকগুলো বলেন?

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মোটামুটি এটি একটি ভারসাম্যমূলক বাজেট হয়েছে। এই মুহূর্তে অন্য যে কোন অর্থনীতিবিদ এর চেয়ে ভাল বাজেট করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। তবে কিছু কিছু দিকে আরও একটু সতর্ক হলে ভাল হত। যেমন বাংলাদেশের সামাজিক ও মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে মদের দাম কমানো উচিত হয়নি। যদিও তা

আ'লীগ আমলের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। এছাড়া মোটামুটি ভারসাম্যমূলক বাজেট হয়েছে। বর্তমানে যে রাষ্ট্রীয় পলিসি আছে, অর্থনৈতিক পলিসিও তার নিয়ন্ত্রণে চলছে। তাছাড়া বিশ্বের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত। কাজেই এ পরিস্থিতিতে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। বর্তমান বাজেটে সেই চেষ্টা আছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর যে দাম বাড়ানো হয়েছে, তা বাড়ানো ঠিক হয়নি। যেমন লবণ, দেয়াশলাইয়ের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ানো হয়েছে। লবণ উৎপাদনে আমাদের দেশ স্বনির্ভর। যেসব পণ্য উৎপাদনে আমাদের দেশ স্বনির্ভর, সে সব পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো নয় বরং আমদানী নিষিদ্ধ করা উচিত। দেয়াশলাইয়ের দাম বাড়ানোতে এমনিতেই এখানকার গৃহিণীরা গ্যাসের চুলা নেভায় না, এখন এ হার আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে করে কিছু টাকা শুল্ক পাওয়া গেলেও গ্যাসের অপচয়ের মাধ্যমে তার কয়েকগুণ বেশী ক্ষতি হবে। আবার এতে আগুন লাগার আশঙ্কাও বেড়ে যাবে। একইভাবে গরীব মানুষের বিড়ির দাম বাড়ানো হয়েছে, যদিও বিড়ি-সিগারেট উভয়ই পরিত্যাজ্য। এটা ঠিক হয়নি।

দারিদ্র্য বিমোচনে যে সতেরশ' কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটা একটা ভাল দিক। তবে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব না হলে এ সুফল টার্গেট গ্রুপ পাবে না। এর সাথে অর্থমন্ত্রী আরেকটি ব্যবস্থা চালু করলে ভাল করতেন– তা হল ঃ যদি যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা বাজেটে সরকারী নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় করা যায় তাহলে তার পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার ওপরে হবে। এটাও দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই এখন থেকে যাকাত আদায়কে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপরে কৃষি ও সমাজ কল্যাণ খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা ইতিবাচক পদক্ষেপ। সামগ্রিকভাবে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ছোট খাট যে সমস্যা আছে তা নিয়ে সংসদে আলোচনা করে সংশোধনীর ব্যবস্থা করবো।

ইনকিলাব ঃ জোট সরকার মানে আপনারা ক্ষমতায় এসে একবার মদের লাইসেন্স দিলেন, আবার মদের দাম কমালেন। তো আপনাদের এই মদপ্রীতির কারণ কি?

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ এই বিষয়টি আমাকেও বিস্মিত করেছে। ইসলামী মূল্যবোধের চারদলীয় জোট সরকার কোনরূপ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কি করে এরূপ একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিল আমি ভেবে পাই না। মদের দাম কমালেই পর্যটন শিল্পের উন্নতি হবে– এটা আহাম্মকি সিদ্ধান্ত। পর্যটনের উন্নতির জন্য প্রথমে আমাদের দেশের পর্যটন সেক্টরগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। তারপর ফেসিলিটিজগুলো বাড়াতে হবে। যেমন– ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, এ্যাকমোডেশন, কমিউনিকেশন, সিকিউরিটি ফেসিলিটিজ বাড়াতে হবে। এগুলো না করে শুধু মদের দাম কমানো কেন, ফ্রি দিলেও এদেশে দলে দলে পর্যটক চলে আসবে– এটা ভাবার কোন কারণ নেই। মদ খাওয়ার

জন্য তারা নিজ দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসবে না।

সব সরকারের মধ্যেই ঘাপটিমারা কিছু ষড়যন্ত্রকারী থাকে। যারা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের কাজ করে থাকে, এটা তাদেরই কাজ। যদিও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তা বাতিল করা হয়েছে। তবুও এই ৩ দিনে সরকারের যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে তা ৩ বছরেও পূর্ণ হবে না।

আর মদের দাম কমানো বাড়ানো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। এটা আমাদের জানার কোন সুযোগ থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কেবিনেটে আলোচনা করা হয়। তবে আমরা জানার পর এটা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি পার্লামেন্ট শুরুর আগেই এই ইস্যুর কবর দিয়েছেন। পার্লামেন্টে আলোচিত হলে ক্ষতি আরও বাড়ত। আমরা মনে করি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে মদের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে নিষিদ্ধ করা উচিত।

ইনকিলাব ঃ বিরোধী দল প্রায়ই দেশে-বিদেশে অভিযোগ করে থাকে জোট সরকারের মধ্যে দু'জন তালেবান সমর্থক আছে। তারা স্পষ্টতই আপনাদের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে ...

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ এ ব্যাপারে আমার বক্তব্যের চেয়ে বর্তমান বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা ও তাদের যে সব প্রতিনিধি এখানে এসেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সুরে বলতে চাই; তারা জামায়াতে ইসলামীকে মৌলবাদী ও তালেবান সমর্থক মনে করেন না। বরং জামায়াতকে তারা মডারেট ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি মনে করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী বা যারা একথা বলেন, তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বলেন। কারণ তারা ভেবেছিলেন তারা এমনভাবে ক্ষমতার বিন্যাস করেছেন যে, তাতে করে সারাজীবন তারা ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু জোটের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। যেহেতু তাদের সেক্যুলার রাজনীতির বিরুদ্ধে জোট গঠনে জামায়াতের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। তাই তারা আমাদের উদ্দেশে এসব বলে মনের ক্ষোভ প্রশমন করেন। অবশ্য এতে গুরুত্ব দিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই।

ইনকিলাব ঃ চারদলীয় জোটের ভবিষ্যৎ কতটুকু?

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ আমি আশাবাদী। কারণ আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন জোট গঠন করিনি। আমাদের প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী আছে। কিন্তু বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে যে মৌলিক শর্তগুলো রয়েছে, যা না হলে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে– এমন সব শর্তে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আর আমাদের নিজেদের ভুলের কারণে বা ভেতরের কোন ষড়যন্ত্রে যদি জোট ভেঙ্গে না যায় তবে আগামীতে জোট ছাড়া কোন অপশক্তি ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে আমি কনফিডেন্ট।

ইনকিলাব ঃ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও বার কাউন্সিলে জোটের প্রার্থীর ব্যাপক পরাজয়ের পরও ...

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় জোটের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে যা দুঃখজনক। তবে জোটের বড় শরীক দল সেখানে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এতটাই প্রাধান্য দিয়েছে যে, তাদের একাধিক প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। এতে করে জোটের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যায়।

ইনকিলাব ঃ কিন্তু যেখানে একক প্রার্থী ছিল সেখানেও.....

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ সেখানে হয়ত প্রার্থী নির্বাচন সঠিক ছিল না। তাছাড়া বাংলাদেশের সব জায়গায় তো জোট সমান শক্তিশালী নয়। এর মধ্যে মানুষের মন পরিবর্তন হতে পারে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার স্থানীয় নির্বাচনে রাজনীতিটা সব সময় প্রাধান্য বিস্তার করে না।

ইনকিলাব ঃ অর্থাৎ আপনি স্বীকার করছেন জোট নয়, ক্ষমতায় থাকার গ্যারান্টি সুশাসন ও দলীয় সংহতি।

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ অবশ্যই। একথা ঠিক যে আমাদের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল তার সবটুকু আমরা পূরণ করতে পারিনি। এ নিয়ে মানুষের দুঃখবোধ আমিও লক্ষ্য করেছি। আগামীতে এ বিষয়ে আরও গুরুত্ব দেয়া হবে।

ইনকিলাব ঃ আপনারা ক্ষমতায় আসার পর পূজামণ্ডপে গিয়েছেন। শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুল দিয়েছেন। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু উত্তরটা পরিষ্কার হয়নি।

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ আমি বড় আলেম নই, ফিজিক্সের ছাত্র। তবে ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু পড়াশোনা করেছি তাতে জানি শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধে যাওয়ার ব্যাপারে ইসলামে কোন নিষেধ নেই। তবে ঐখানে গিয়ে কি কাজ করা হবে তার ওপরই বিধি-নিষেধ আছে। শহীদ মিনারে গিয়ে কেউ দোয়া-খায়ের করতে পারে। আবার সামাজিক কায়দায় ফুলও দিতে পারে। শহীদ মিনারে ফুল দেয়াতে পাপও নেই আবার পুণ্যও নেই। তবে সেখানে গিয়ে যদি কেউ দোয়া করে তবে যাদের উদ্দেশ্যে করা হয় তারাও ছওয়াবের ভাগী হন। যিনি করেন তিনিও হন। আমাদের যে দু'জন মন্ত্রী আছেন, তারা সেখানে পূর্ব নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে যান। তারপর তারা সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করে থাকেন। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।

তাই যদি হয় তাহলে আমাদের রাসূলে পাক (সাঃ) কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তি থাকা সত্ত্বেও তার দিকে কেবলা করে মদীনায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরও নামাজ পড়েছেন। চূড়ান্তভাবে মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত নবী (সাঃ) এগুলোতে হাত দেননি। তার কারণ পরবর্তী পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব ছিল কিনা আল্লাহই জানেন। এমনকি আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব ছিল না তবুও ফেরেশতাদের দিয়েও ধ্বংস করেননি। তাঁর নবী কাবাশরীফের দিকে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালা নবী (সাঃ) কেউ সব কথা একবারে বলার জন্য নির্দেশ দেননি। তাই যদি হত তাহলে কোরআন শরীফ ২৩ বছর ধরে নাজেল হত না। আল্লাহ কোন কিছু বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দেননি।

তেমনিভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন ধরে যেসব অপসংস্কৃতি অথবা সামাজিক সংস্কার, প্রথা প্রচলন আছে যারা বলছেন আজ যদি তারা জামায়াতের জায়গায় আসেন তারা কি এগুলো একবারে পরিবর্তন করতে পারবেন, যদি না পারেন তাহলে কেন বলেন? এখানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের পর যেসব আলেমগণ আধুনিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে ইসলামী চিন্তা-ভাবনা করেন তারা একসাথে বসে যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তা রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত হলেই এসব মত-পার্থক্যের নিরসন হবে। তার আগ পর্যন্ত এসব মতপার্থক্য থাকবেই। যেহেতু আমাদের ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।

ইনকিলাব ঃ একটি বিশেষ মহল দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি বলে জাতিকে বিভক্তের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু নতুন প্রজন্ম যারা অতীতের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ফেলে সামনের দিকে যেতে চায়, তাদের অনেকেই পারভেজ মোশাররফের দুঃখ প্রকাশের পর মনে করেন জামায়াতও হয়তো '৭১-এর ভূমিকার কারণে এরূপ দুঃখ প্রকাশ করতে পারে।

আবদুল কাদের মোল্লা ঃ এখানে পারভেজ মোশাররফ ও জামায়াত এক জিনিস নয়। পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে আক্রমণকারী ছিলেন। কাজেই এটা তার রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত অবস্থান হতে পারে। আমরা তো ঐ কারণে ঐভাবে জনগণের ওপর কোন নির্যাতনও করিনি বা বিশেষ কোন গেস্টাপো বাহিনী তৈরী করে জনগণকে হত্যাও করিনি। আমাদের একটা রাজনৈতিক অবস্থান ছিল যে, আমরা নির্বাচনের পর পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের পর সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করার ব্যাপারটি আমাদের দৃষ্টিতে মর্যাদাকর মনে হয়নি। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা ক্ষমতায় বসলে পাকিস্তানীরাই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসেবে ভাববে তারা আমাদের সাথে থাকবে কিনা। এটা আমাদের স্ট্রংগেস্ট ভিউ। যার কারণে আমরা রাজনৈতিক এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারিনি।

এরপর হল ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতীয় হিন্দুরা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া রাখার চেষ্টা করেছে। যার জন্য গান্ধী অনশন করেছিল। সেই ইন্ডিয়া যখন কোন কাজে অতি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে, তখনই আমরা সন্দেহ করেছিলাম যে ভারত আমাদের স্বাধীন করার জন্য সাহায্য করছে না। বরং বড় একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে হজম করার জন্য এসেছে। এ কারণে আমরা ঐ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারিনি। আমাদের এই আশঙ্কা যে সঠিক ছিল, তা স্বাধীনতার ত্রিশ বছরে ভারত তাদের আচরণে প্রমাণ করেছে। আমাদের রিয়্যাল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের কোন

পদক্ষেপও ছিল না। সিদ্ধান্তও ছিল না। আমাদের একটি পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত ছিল। সে আশঙ্কাটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে ভারতের আচরণে। আপনিই বলুন, এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করার কি আছে। এজন্য আমি মনে করি দুঃখ প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। তবে এর পরও যদি আমাদের কোন আচার-আচরণে দেশের জনগণ পারিবারিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে সেজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে আমাদের সাবেক আমীরে জামায়াতও নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার পর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।